ফেব্রুয়ারি

অমর একুশে

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩

The Martyrs' Day & International Mother Language Day 2013

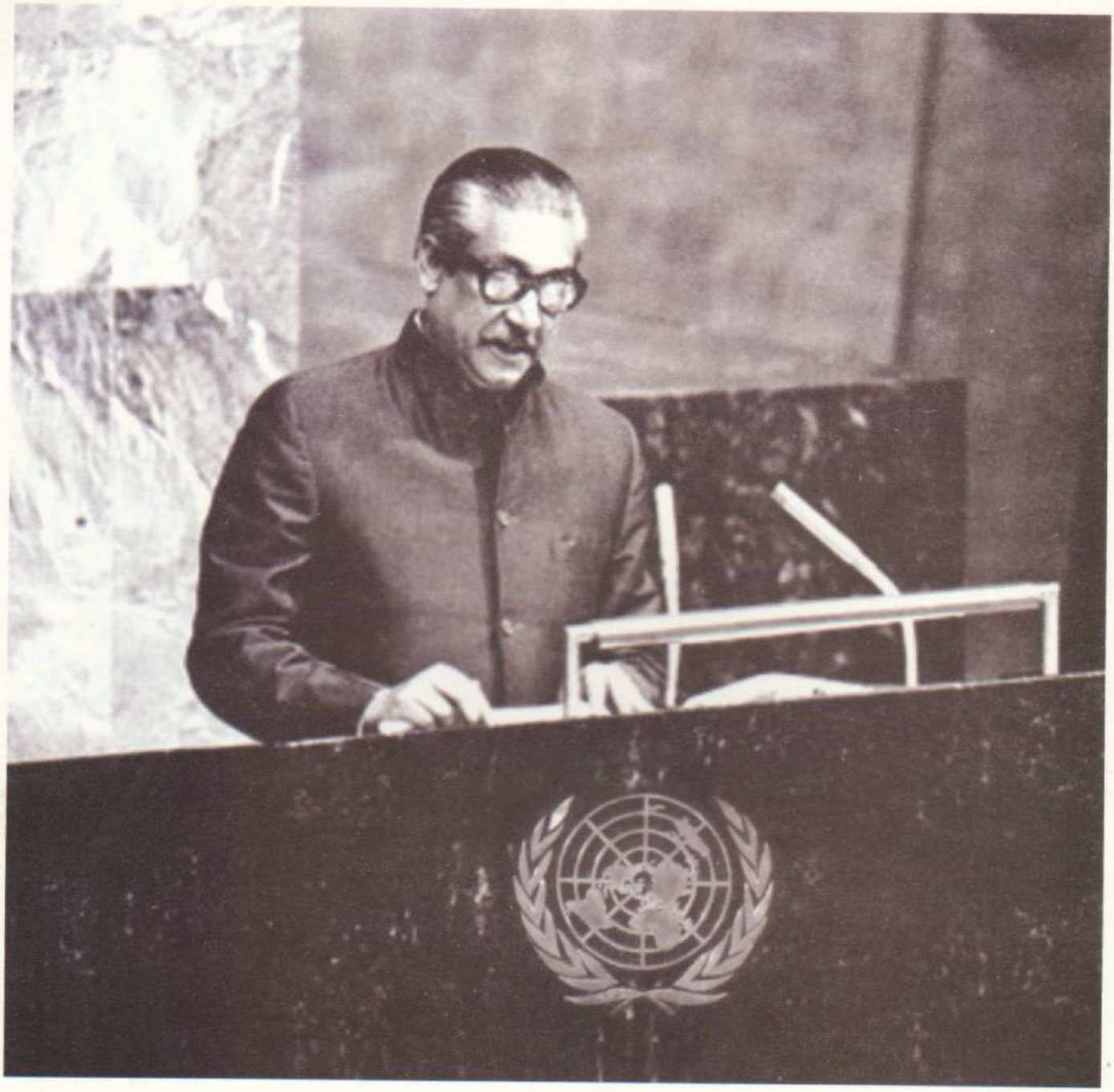

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাংলা ভাষায় প্রথম ভাষণ দান করছেন।
২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

আবুল বরকত
জন্ম: ১৬ জুন ১৯২৭ সাল।
পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে।
শহীদ হন: ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল।

রফিকউদ্দিন আহমদ
জন্ম: ৩০ অক্টোবর ১৯২৬ সাল।
মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর থানার পারিল গ্রামে।
শহীদ হন: ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল।

শফিউর রহমান
জন্ম: ২৪ জানুয়ারি ১৯১৮ সাল।
পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার কোন্নগর গ্রামে।
শহীদ হন: ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

আবদুল জব্বার
জন্ম:
ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানায়।
শহীদ হন: ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

আবদুস সালাম
জন্ম: ১৯২৫ সাল।
ফেনীর জেলার দাগনভুঁইঞা উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে।
শহীদ হন: ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

আবদুল আউয়াল
জন্ম:
ঠিকানা ১৯ হাফিজুল্লাহ রোড, ঢাকা।
শহীদ হন: ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

অহিউল্লাহ
জন্ম:

শহীদ হন: ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৯ ফাল্গুন ১৪১৯
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বাণী

একুশে ফেব্রুয়ারি মহান 'শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। আমি এ দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী ভাষা শহীদ বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহীদদের। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। এ দিবস উপলক্ষে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলন কেবলই আমাদের মাতৃভাষার দাবি আদায় করেনি; বরং তা বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় এবং স্বাধিকার অর্জনে বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করে। এ আন্দোলনের পথ বেয়ে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় বাঙালি জাতির বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। আমি আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষা শহীদ ও ভাষা সৈনিককে; যাঁদের অসীম সাহস ও অদম্য প্রেরণায় ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি অর্জন করে মাতৃভাষার অধিকার। ভাষা আন্দোলন আমাদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির লালনসহ সামনে এগিয়ে যাওয়ার অফুরন্ত প্রেরণা যোগায় এবং সকল অন্যায়, অবিচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উজ্জীবিত করে।

কোন জাতির আত্মত্যাগ কখনো বৃথা যায় না। আমরা গর্ববোধ করি এই ভেবে যে 'শহীদ দিবস' আজ পরিণত হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে'। আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের যে গভীর তাৎপর্য তার অনুরণন আজ আমরা সারাবিশ্বে দেখতে পাই 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে। অমর একুশে তাই কেবল আমাদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রাকে অনুপ্রাণিত করছে না; বরং তা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে লালন ও সংরক্ষণে উৎসাহ যোগাচ্ছে। মূলত মহান ভাষা দিবস আজ পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছে, বিশ্ববাসীকে করেছে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ।

ভাষা ও সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে চলে। পৃথিবীর বর্ণাঢ্য ভাষা ও সংস্কৃতির বহমান ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে লুপ্তপ্রায় ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় বিশ্ববাসী আরও অবদান রাখবেন বলে আমার বিশ্বাস। পৃথিবীর সব নৃতাত্ত্বিক জাতি-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষিত হোক, গড়ে উঠুক এক শান্তিপূর্ণ বিশ্ব, মহান 'শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে'—এই আমার প্রত্যাশা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জিল্লুর রহমান

মোঃ জিল্লুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ ফাল্গুন ১৪১৯
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বাণী

মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষাভাষীসহ বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির জনগণকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে শোক, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। ১৯৫২ সালের এ দিনে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, শফিউদ্দিন, সালামসহ আরও অনেকে।

আজকের এই দিনে আমি ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি।

১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। এদিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ তাঁরা মুক্তি পান। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিবুর রহমান। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে।

এই বছরের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবারও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান। ১৪ অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হয়। কারাগার থেকেই তাঁর দিকনির্দেশনায় আন্দোলন বেগবান হয়। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারি করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষা শহীদরা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি সেই রক্তস্নাত গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হচ্ছে। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার এ বিষয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যার ফলশ্রুতিতে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আজ সারাবিশ্বের সকল নাগরিকের সত্য ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রেরণার উৎস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

বিশ্বের ২৫ কোটি মানুষের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আমি ইতোমধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি।

বিশ্বের সকল ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা এবং ভাষা সংরক্ষণের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি।

অমর একুশে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে ক্ষুধা, দারিদ্র, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা এবং নিরক্ষরতা মুক্ত আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। গত চার বছরে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি।

আসুন, সকল ভেদাভেদ ভুলে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার শপথ নেই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

09 Falgun 1419
21 February 2013

Message

I extend my best wishes to the Bangla-speaking people at home and abroad, and people of all languages and cultures across the world on the occasion of the glorious Martyrs' and International Mother Language Day.

The greatest Ekushey is the symbol of grief, strength and glory in the life of every Bangalee. On this day in 1952, many valiant sons of the soil, including Rafiq, Shafique, Jabbar, Barkat, Shafiuddin and Salam, sacrificed their lives for protecting the dignity of the mother tongue.

I pay my deep homage to the memories of the martyrs. I also pay my deep respect to the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who had steered the language movement. I also recall with great respect the contributions of all other language veterans.

In 1948, State Language Action Council comprising Chhatra League, Tamuddun Majlish and other student organisations was constituted. The council called a hartal on 11 March 1948 to press home for making Bangla as the state language. Bangabandhu along with many other student leaders were arrested from in front of the Secretariat on that day. They were freed on March 15. Sheikh Mujibur Rahman presided over a meeting on Dhaka University campus on March 16. The language movement had spread all over the country.

Bangabandhu was again arrested from Faridpur on 11 September 1948. He was freed on 21 January 1949. He was again detained on 19 April and freed at the end of July. On 14 October 1949, Bangabandhu was again imprisoned. Under his directives from behind the bar, the language movement had got momentum. In continuation of the vigorous movement, the language martyrs sacrificed their lives on the 21st February in 1952 while breaking Section 144 imposed by the rulers.

The blood-stained resonance of Amar Ekushey is now resounded in the hearts of the people of 193 countries surpassing the boundary of Bangladesh. A number of Bangladeshi expatriates including Salam and Rafiq, in Canada took initiative to recognize the 21st February as the International Mother Language Day. Later, the then Awami League Government placed a proposal in the UN in this regard. Subsequently, the UNESCO declared the day as International Mother Language Day on 17 November 1999.

The International Mother Language Day is now a source of inspiration for all the people of the world to establish the truth and justice.

I have already placed the demand in the UNGA to make Bangla, spoken by 25 crore people of the world, as one of the official languages of the UN.

We have established International Mother Language Institute for carrying out research on all languages of the world and preserving those.

The greatest Ekushey is the symbol of our democratic values, Bangalee nationalism, spirit of liberation struggle and secularism. We have made a good progress in the pledges made to build a modern digital Bangladesh free from hunger, poverty, terrorism, communalism and illiteracy in last four years' journey of our government.

Let us take a fresh vow being imbued with the spirit of the great Ekushey to work together for improving the lot of the people sinking all differences.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live for ever.

Sheikh Hasina

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ ফাল্গুন ১৪১৯
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বাণী

৫২-এর ভাষা আন্দোলনে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা ঘটেছিল। ১৯৫২ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য পূর্ববাংলার মানুষ শুধু অভিন্ন চেতনাকে ধারণ করেনি, প্রত্যাশা পূরণের জন্য তারা সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। সমগ্র জাতির আকাঙ্ক্ষাকে বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দীপ্ত তরুণ সমাজ–শহীদ হয়েছেন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ আরো অনেকে।

পরবর্তীকালে স্বৈরশাসকদের কূটকৌশল ও অপশাসন যখনই এ ভূখণ্ডের জনসাধারণের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে তখনই আমরা দীক্ষা নিয়েছি অমর একুশের কাছে। বলা যায়, ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যার সূচনা, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। কালান্তরে এসে মূল্যায়ন করতে গেলে স্পষ্ট অনুভব করা যায় যে, একুশে মূলত একটি প্রতীক, এক অবিনাশী চেতনা। এ বোধ আমাদের ক্রমরূপান্তর ঘটায়, আমাদের আহ্বান জানায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠার, উজ্জীবিত করে অপশাসন-অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার এবং প্রেরণা যোগায় সেই মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার–যার অন্য নাম সত্য, ন্যায় ও মানবিকতা। বাঙালির ২১ আজ সারা বিশ্বের মাতৃভাষা রক্ষায় আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হয়ে ওঠার মাধ্যমে আমাদের গৌরব, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগ্রাম ও প্রেরণা বিশ্বমাঝে প্রসারিত হয়েছে। পৃথিবীর বিপন্ন ও প্রায়-বিপন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে অসাধারণ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে; সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে নিজেদের উদ্যোগে তারা তাদের ভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশে নিয়োজিত হয়েছেন। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়। সকল নৃ-ভাষাগোষ্ঠীর মাধ্যমে তা যত প্রসারিত হবে ততোই বিশ্বের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সুরক্ষিত হওয়া ছাড়াও সকল ভাষাভাষীর মধ্যে সহমর্মিতা ও পরস্পর শ্রদ্ধাবোধের এক বিশ্বসংস্কৃতি গড়ে উঠবে। আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সে লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এ প্রতিষ্ঠান তার সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করবে; বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের সকল মাতৃভাষাভাষীর মধ্যে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রেরণা সৃষ্টি করবে।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনসহ একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

আমি সকল উদ্যোগের সাফল্য প্রত্যাশা করছি।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি)

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ ফাল্গুন ১৪১৯
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বাণী

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন হলেও আমাদের জাতিসত্তার জাগরণের ইতিহাসে এর ভূমিকা গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। একুশে আমাদের মধ্যে প্রথম জাতিগত সচেতনা জাগ্রত করেছে। সেদিন আমরা যে প্রেরণায় উজ্জীবিত ও সংঘবদ্ধ শক্তিতে জাগরিত হয়ে উঠেছিলাম, পরবর্তীকালেও তা মেধা ও মননে বহন করেছি। আমাদের সকল স্বাধিকার আন্দোলন এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের ইতিহাসে সে-পরিচয়ই উৎকীর্ণ হয়ে আছে। তাই একুশ আমাদের চেতনায় বহ্নিশিখা–যা আমাদেরকে পথ দেখায়, অন্ধকার থেকে আলোয় প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানায়।

একুশের চেতনা শুধু এই ব-দ্বীপাঞ্চলের তটভূমিকেই গৌরবান্বিত করেনি, আজ তা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা অতিক্রম করে এবং সাগর-মহাসাগর পেরিয়ে স্পর্শ করেছে বিশ্বকে। একুশ থেকে এখন উৎপ্রাণিত হচ্ছে বিশ্বের সকল নৃ-গোষ্ঠী; লাভ করেছে সেই উৎসাহ ও শক্তি, যা তাদের জাতিসত্তা ও ভাষিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় শক্তি ও সাহস জোগাচ্ছে। সকল মানুষের শ্রমে ও নিবেদনে নির্মিত হয়েছে মানব সভ্যতা। সকলের অস্তিত্ব ও স্বকীয়তাকে মানতে হবে; আর সেই বোধে সুস্থির হতে পারলে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপন্ন মনোভাবকে লালন করলেই এ বিশ্ব সবার বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিবছর বিশ্বমানবের কাছে সেই বার্তাই বয়ে আনে, ডাক দিয়ে যায় জীববৈচিত্র্য রক্ষার মতো ভাষাবৈচিত্র্য রক্ষারও।

শান্তি, সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্যেই নিহিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-এর প্রকৃত তাৎপর্য। এ-লক্ষ্যে বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। গত ২০১০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ-ইনস্টিটিউট ভবন উদ্বোধন করেছেন। ইনস্টিটিউটের প্রথমপর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়পর্যায়ের প্রকল্পের কাজ চলছে। *আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন ২০১০* সালে পাশ হয়েছে। ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অডিটরিয়ামের নির্মাণ কাজ অচিরেই সম্পন্ন হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জানাই অসীম কৃতজ্ঞতা। তিনি প্রতি বছরের মতো এবারও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধনে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। তাঁর উৎসাহ ও নির্দেশনায় আগামী দিনে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরো বেগবান হবে।

আমি ইনস্টিটিউটের সকল আয়োজনের সাফল্য কামনা করি।

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)

পুনঃ মুদ্রণ*

‘ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়’

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী নয়, মূলত শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ। এই দিনই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। একমাত্র কুমিল্লার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্তই উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদ করেন এবং উর্দুর সাথে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান। কোনো বাঙালী মুসলমান প্রতিবাদ করেন নি। এটা লজ্জাজনক ইতিহাস।

১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষার আন্দোলন ছিল না; বাঙালীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এর সাথে জড়িত ছিল।

আমাদের ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের মধ্যেই এ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি নিহিত আছে।

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি ঘোষণা করছি, আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সকল সরকারী অফিস-আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু করবে। এ ব্যাপারে আমরা পরিভাষা সৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করবো না। কারণ তাহলে সর্বক্ষেত্রে কোনদিনই বাংলা চালু করা সম্ভবপর হবে না। এ অবস্থায় হয়তো কিছু কিছু ভুল হবে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এভাবেই অগ্রসর হতে হবে।

স্বাধীনতার পর আমাদের সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে আচরণ করা হয়েছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দালাল বলা হয়েছে। এমনকি ভাষা আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমদানী করা হয়েছে বলা হতো। বাঙালী হিসেবে আমরা অনেক উদারতার পরিচয় দিয়েছি। তা না হলে আমরা বাংলাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাতে পারতাম। কিন্তু সেদিন আমরা উর্দুর সাথে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়েছিলাম।

বাঙালীর স্বাজাত্যবোধকে টুঁটি চেপে হত্যার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বার বার এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ভাষার উপর আঘাত হেনেছে, আর তাকে প্রাণ দিয়ে প্রতিহত করেছে এ দেশের তরুণরা। কিন্তু তাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ক'জন আছেন? বিবেকের কাছেই তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে। আপনাদের লেখনী দিয়ে বের হয়ে আসা উচিত ছিল এ দেশের গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীরসন্তান সূর্যসেনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। তাঁর কথা বলতে আপনারা ভয় পান। কারণ তিনি ছিলেন হিন্দু। এদের ইতিহাস লেখা এবং পাঠ করার জন্যে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানাই। একদিন বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা বলা যেতো না। কিন্তু আজ এই জাতীয়তাবাদ সত্য।

*১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আয়োজিত ভাষা আন্দোলনের স্মরণ সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ।

একে রোধ করতে পারে এমন কোনো ক্ষমতা নাই। এই প্রথমবারের মতো বাঙালী একতাবদ্ধ হয়েছে। নিজেদের দাবীতে বাঙালীরা আজ ঐক্যবদ্ধ।

ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল এই বাংলা একাডেমী। ১৯৫২ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এই ভবনে বসেই ভাষা আন্দোলনকারীদের উপর গুলীর আদেশ দিয়েছিলেন। তাই যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালে ক্ষমতায় এসে এখানে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে। এই বাংলা একাডেমীকে কেন্দ্র করে স্বৈরাচারী সরকার কত খেলাই না খেলেছে, তা এ দেশের মানুষের জানা আছে। বাংলা একাডেমীর মতো একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে মাত্র ৩ লাখ টাকা সরকার বার্ষিক বরাদ্দ করেছে। এর জন্যে কাকে দোষ দেবো; যারা এসব করছে, সে আমলারা তো এ দেশেরই ছেলে। বাংলা একাডেমীর ভিতরের সব কথাই আমি জানি। লোক বদল করে নতুন নতুন লোক এনে বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণের যে চেষ্টা চালানো হয়েছে, তাও জানি।

স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে ফেব্রুয়ারীর গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা একাডেমী যে সপ্তাহ পালন করছে সে সপ্তাহ বাংলাদেশের এক কঠিন সপ্তাহ। ফেব্রুয়ারীর এই দিনেই বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা, এই সপ্তাহেই কুর্মিটোলার বন্দিশিবিরে হত্যা করা হয়েছে সার্জেন্ট জহুরুল হককে, এই সপ্তাহেই শহীদ হয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা, আর এই সপ্তাহেই কারফিউ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে আত্মাহুতি দিয়েছে এ দেশের অসংখ্য মায়ের অসংখ্য নাম না জানা সন্তান। স্বৈরাচারী চক্র সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে কোন কোন প্রফেসরকে দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু কই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক তো সেই স্বৈরাচারী কার্যকলাপের প্রতিবাদে তখন পদত্যাগ করেন নাই? তখন অধ্যাপকরা একযোগে পদত্যাগ করলে আন্দোলনে এত রক্তক্ষয়ের প্রয়োজন হতো না।

মুক্ত পরিবেশেই ভাষার বিকাশ হয়। ঘরে বসে ভাষার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না। এর পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় ব্যবহারের ভিতর দিয়ে। ভাষার গতি নদীর স্রোতধারার মতো। ভাষা নিজেই তার গতিপথ রচনা করে নেয়। কেউ এর গতি রোধ করতে পারে না। এই মুক্ত পরিবেশে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের অতীত ভূমিকা ভুলে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলা ভাষাকে গণমুখী ভাষা হিসেবে গড়ে তুলুন। জনগণের জন্যেই সাহিত্য। এ দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের লেখনীর মাধ্যমে নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন, দুঃখী মানুষের সংগ্রাম নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করুন। কেউ আপনাদের বাধা দিতে সাহস করবে না।

আমরা জনগণের দাবী আদায়ের জন্যে রাজনীতি করি। তবে তার মানে এই না যে, আমরা ক্ষমতা চাই না। আমরা দাবী আদায়ের জন্যেই ক্ষমতায় যেতে চাই। ক্ষমতা পেলে আমরা একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করবো। আমাদের 'জয় বাংলা' স্লোগানের মধ্যেই এ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি নিহিত আছে। তবে দাবী আদায় না হলে আমরা ক্ষমতা ছেড়ে চলে আসবো। জয় বাংলা!

[সংগৃহীত: বাঙালি কণ্ঠ, সম্পাদক, মোনায়েম সরকার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, মে ২০০০]

প্রমিত বাংলাভাষা

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

বাংলাভাষা ও সাহিত্য গত হাজার বছরে একটি উন্নত ও ঐশ্বর্যশালী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। বাংলাভাষা এখন একটি নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক মানে গিয়ে পৌঁছেছে।

পরিবর্তনশীল সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মুখের ভাষাও পরিবর্তিত হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়েও একটি ভাষার একক কোন রূপ থাকে না; স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একই ভাষার রূপ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ভাষা বহুরূপী, একই ভাষার একই বা বিভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সৃষ্টি হওয়ার পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে, যেমন–ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি। একটি ভাষার ভৌগোলিক রূপান্তর যে কত বিচিত্র হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইংরেজিভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ইন্দো-জার্মানিক শাখা থেকে উদ্ভূত ইংরেজিভাষা ইংল্যান্ড দ্বীপ থেকে সৃষ্ট হয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে একদিকে উত্তর আমেরিকা ও কানাডায়, অপরদিকে সাত সমুদ্র পেরিয়ে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজিভাষার বয়স হয়তো কয়েক হাজার বছরের। কিন্তু আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে ইংরেজি ভাষাভাষীদের বসতিস্থাপন কয়েক শত বছরের মাত্র। একুশ শতকের প্রথম দশকে এসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইংরেজিভাষার তুলনা করলে বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে কত পার্থক্য! ইংরেজিভাষার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ঘটেছে মূলত ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে। বর্তমান পৃথিবীর যেসব দেশের মাতৃভাষা ইংরেজি, সেই সব দেশে আবার ভাষার ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈচিত্র্য যেমন গভীর তেমনি ব্যাপক। ইংরেজিভাষার অন্তত পাঁচটি প্রমিত বা স্ট্যান্ডার্ড রূপ প্রচলিত।

বর্তমানে বাংলাভাষা পৃথিবীর একাধিক দেশে প্রচলিত, তবে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল বলতে প্রধানত দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম বা অসম, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা বা ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্য আর বঙ্গোপসাগরের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে বাংলাভাষাভাষী এলাকাকে বোঝায়। এছাড়াও পৃথিবীর প্রায় ১৮৮টি দেশে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বাংলাভাষীরা বসবাস করেন। জনসংখ্যার হিসাবে পৃথিবীর ভাষাগুলির মধ্যে বাংলাভাষার স্থান চতুর্থ। স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় না যে, এখন থেকে হাজার-দেড় হাজার বছর আগে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মাধ্যমে যে বাংলাভাষার সৃষ্টি এবং যে ভাষা দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে সম্প্রসারিত, সে ভাষার রূপ অপরিবর্তিত থাকবে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এবং বিভিন্ন বিদেশি ভাষার সংসর্গে এসে বাংলাভাষা অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগে অর্থাৎ বৌদ্ধ-হিন্দু এবং মুসলিম শাসনামলে বাংলাভাষার বিভিন্ন উপ-ভাষার রূপ থাকলেও কোন প্রমিত রূপ ছিল কিনা সন্দেহ? প্রাচীন ও মধ্য যুগ জুড়ে বাংলাভাষা কখনও রাজভাষা বা দরবারি ভাষার মর্যাদা পায়নি। বৌদ্ধপালরাজাদের আমলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ প্রথম বাংলাভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা বা 'চর্যাপদ' রচনা করেন। উল্লেখ্য যে, সে সময়ে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার প্রাধান্য

ছিল। কর্ণাটকী ব্রাহ্মণ সেনরাজাদের আমলে সংস্কৃত ছিল রাজভাষা। তুর্কি, পাঠান ও মোগল আমলে দরবারি ভাষা ছিল ফার্সি। মধ্যযুগ জুড়ে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান কবিরা বাংলা বর্ণমালায় সাধুরীতির বাংলাভাষায় কাব্যরচনা করে গেছেন এবং তাঁরা কাব্যের সূচনাতে রাজা বা সুলতানদের প্রশস্তি গেয়েছেন। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্য বাংলার কোন রাজধানীতে বাংলাভাষা ও সাহিত্য চর্চার কোন কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি, যদিও নদীয়ায় শ্রীচৈতন্যের কারণে বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে উঠেছিল।

ইংরেজ আমলে আধুনিকযুগে অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কোলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে প্রথম বাংলাভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। গদ্যে সাহিত্যচর্চা, ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা, সাময়িকপত্রের প্রকাশনা, সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের রচনার মাধ্যমে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের উদাহরণ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ক্যালকাটা মাদ্‌রাসা, সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতিষ্ঠা। উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মাধ্যমিক স্কুলপর্যায়ে বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় ১৯৪০ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯২১ সালে, আর ঢাকা কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৯ শতকে (১৮৪১)। যেখানে মধ্যযুগের বাংলায় কিছু সংস্কৃত টোল ও আরবি মক্তব-মাদ্‌রাসা ছাড়া বাংলাভাষায় শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না, সেখানে বাংলা পাঠশালাও প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজ আমলে। আমাদের বাংলা বর্ণপরিচয় শিখিয়েছেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরেজ আমলে। মধ্যযুগে যাঁরা বাংলা সাহিত্যচর্চা করেন তাঁরা ছিলেন স্বশিক্ষিত এবং গ্রামের মানুষ। ইংরেজ আমলে যাঁরা বাংলাভাষা ও সাহিত্য চর্চা করেন তাঁরা ছিলেন মূলত নগরবাসী এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত।

ইংরেজ আমলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিস্ময়কর অগ্রগতির স্বীকৃতি ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে। ১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' নামক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের জন্য চলিতরীতির প্রবর্তন ছিল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বলা বাহুল্য যে, বাংলাসাহিত্যে চলিতরীতির প্রচলন হয়েছিল কথ্যবাংলার প্রমিতরূপ থেকেই। সাধারণত একটি দেশ বা জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বা রাজধানীকে কেন্দ্র করে একটি ভাষার প্রমিতরূপ গড়ে উঠে। একটি ভাষা অনেকগুলো উপভাষার সমাহার; সেসব উপভাষার একটিকে কেন্দ্র করে অন্যান্য উপভাষা থেকে উপাদান নিয়ে প্রমিতভাষা গড়ে ওঠে। প্রমিতভাষা হল একটি সামাজিক ও কৃত্রিম উপভাষা, যার প্রধান শর্ত সর্বজনবোধ্যতা। যেহেতু একটি প্রমিতভাষা ঐ ভাষারই বিভিন্ন উপভাষার উপাদান নিয়ে গঠিত হয়, সে কারণে প্রমিতভাষা উপভাষাভাষীদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বা যোগাযোগের ভাষারূপে কাজ করে। একটি ভাষার প্রমিতরূপ আনুষ্ঠানিক ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু একটি ভাষার বিভিন্ন উপভাষার বোধগম্যতা সব মানুষের জন্য সহজলভ্য নয়, সে কারণে সবার বোধগম্য ভাষার একটি রূপ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সে ভাষা অফিসে, আদালতে, বেতারে, টেলিভিশনে, শ্রেণীকক্ষে, সভা-সমিতিতে ব্যবহৃত হতে পারে। এই প্রয়োজন থেকেই ইংরেজ আমলে অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কোলকাতায় প্রমিত বাংলাভাষার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগপর্বে আজকের রাজধানী ঢাকা-সহ পূর্ববাংলা প্রদেশের সৃষ্টির সময় অবিভক্ত বাংলার প্রমিত বাংলাভাষাকে পূর্ববাংলার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে, বেতার ও টেলিভিশনের আনুষ্ঠানিক ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়। দেশবিভাগের সময় কোলকাতা থেকে আগত সরকারি কর্মচারী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবার-পরিজন নবসৃষ্ট পাকিস্তানের পূর্ববাংলায় প্রমিত বাংলাভাষা চর্চা ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। দেশবিভাগের আগে থেকেই পূর্ববাংলায় আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলাভাষার প্রচলন ছিল, যা দেশবিভাগের পর বহু গুণ বৃদ্ধি পায়–বিশেষ করে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশবিভাগ এবং ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর প্রায় ৬৫ বছর কেটে গেছে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ঢাকা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী। তারপরেও কেটে গেছে চল্লিশটি বছর। বাংলা এখন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। ঢাকাকে কেন্দ্র করে বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক নতুন অভিযাত্রা শুরু হয়েছে,

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করছেন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

যা বাংলা রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি লাভের পর আরও বেগবান হয়ে উঠেছে। বাংলাভাষার ক্ষেত্রে এই সময়ের মধ্যে দুটি প্রমিতরূপ গড়ে ওঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে–এর একটি কোলকাতাকেন্দ্রিক, যার পশ্চাদ্‌ভূমি পশ্চিমবঙ্গ। অপরদিকে ঢাকাকেন্দ্রিক প্রমিত বাংলাভাষার যে রূপান্তর ঘটছে তার পশ্চাদ্‌ভূমি হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল। কোলকাতা ও ঢাকার প্রমিত বাংলাভাষা শুরুতে এক থাকলেও বর্তমানে এর স্ব স্ব বৈচিত্র্য লক্ষ করা যাচ্ছে। ঢাকা ও কোলকাতার বিভিন্ন টেলিভিশনে প্রচারিত অনুষ্ঠানে, বিশেষত সংবাদে ও কথিকাসমূহে ব্যবহৃত প্রমিত বাংলার তুলনা করলে কোলকাতার প্রমিতবাংলা ও ঢাকার প্রমিতবাংলার মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। এই পার্থক্য বিশেষভাবে ফুটে ওঠে বাচনভঙ্গি বা অ্যাকসেন্ট ও স্বরভঙ্গিতে, বাক্যগঠন প্রক্রিয়ায় এবং শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। বলা বাহুল্য যে, এই পার্থক্য ক্রম-বর্ধমান এবং বৃটিশ ও আমেরিকান ইংলিশের মতো ভবিষ্যতে বাংলাভাষার দুটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রূপ গড়ে ওঠার পথে চলমান। বাংলাভাষার দুটি প্রমিতরূপ গড়ে ওঠার পেছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ছাড়াও সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিকা ক্রিয়াশীল। সর্বোপরি কোলকাতার প্রমিতভাষায় পশ্চিমবাংলার উপভাষাগুলোর প্রভাব এবং ঢাকার প্রমিতভাষায় বাংলাদেশের উপভাষাগুলোর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই অধিক ও কার্যকর; চূড়ান্ত বিচারে যা কোলকাতা ও ঢাকার প্রমিত বাংলাভাষাকে আরও স্বতন্ত্র করে তুলছে।

পৃথিবীর ছোট-বড় সব দেশের ভাষাতেই বিভিন্ন উপভাষা এবং এক বা একাধিক প্রমিত ভাষা রয়েছে। উপভাষা হচ্ছে ঘরের ভাষা–অনানুষ্ঠানিক ভাষা, আর প্রমিতভাষা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক ভাষা। এ দুটোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বাংলাদেশে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব খুব বেশী এবং সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু গত ষাট বছর যাবৎ বাংলাদেশে ঢাকাকেন্দ্রিক যে প্রমিতভাষা গড়ে উঠেছে, জাতীয় ঐক্যের জন্যে তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কম নয়। পৃথিবীর কোন দেশে শ্রেণীকক্ষে আঞ্চলিক ভাষায় পাঠদান করা হয় না, বরং

প্রমিতভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম হতে পারে না, বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক, সংবাদপত্রে গদ্যের চলতিরীতি ব্যবহৃত হয়, যা কথ্য প্রমিতরীতির অনুরূপ। আগে লেখ্যভাষা ছিল সাধুরীতিতে এবং কথ্যভাষা প্রমিতরীতিতে। ফলে এই দুই রীতির মধ্যে একটা বিরোধ ছিল। বর্তমানে ভাষার কথ্য ও লেখ্য রীতির সেই পার্থক্য অনেকটা দূর হয়েছে। এখন আমরা অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রমিতভাষা ব্যবহার করতে পারি। এই দুই ভাষারীতির মিশ্রণ ঘটাবার কোন প্রয়োজন নেই।

বাংলাভাষা ও সাহিত্য গত হাজার বছরে একটি উন্নত ও ঐশ্বর্যশালী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। বাংলাভাষা এখন একটি নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক মানে গিয়ে পৌঁছেছে। একুশ শতকে তথ্য-প্রযুক্তির যে বিপ্লব ঘটে গেছে, বাংলাভাষা তার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আরও উন্নত হবার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের তরুণ প্রজন্ম তাদের শিক্ষাজীবনের সূচনালগ্ন থেকে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাভাষা চর্চার সুযোগ পেলে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটছে। এর সঙ্গে বাংলাভাষা যুক্ত থাকলেও তা সম্প্রসারণের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্য এবং জ্ঞানভাণ্ডারকে ইন্টারনেট, উইকিলিক্স, ই-বুক ইত্যাদির মাধ্যমে সবার কাছে তুলে ধরতে হবে। এ দায়িত্ব পালন করতে হবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-কে। সেজন্যে ইনস্টিটিউটকে তথ্য-প্রযুক্তির সর্বাধুনিক ব্যবস্থাদির সুবিধা সমন্বিত হতে হবে। উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা ছাড়া আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রমিত বাংলাভাষাকেই গুরুত্ব দিতে হবে।

বাংলাভাষা আজ একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। একুশে ফেব্রুয়ারি "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" রূপে 'ইউনেস্কো' কর্তৃক স্বীকৃত। বাংলাভাষা জাতিসংঘের অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক ভাষারূপে মর্যাদা পাওয়ার পথে রয়েছে। সেদিন হয়তো বেশী দূরে নয় যেদিন বাংলাভাষা ইংরেজি, ফরাসি, চীনা, স্প্যানিশ, আরবি প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে ও সমকাতারে জাতিসংঘের প্রাতিষ্ঠানিক ভাষারূপে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু সেজন্যে এখন থেকেই প্রস্তুতির প্রয়োজন। জাতিসংঘের কোন আনুষ্ঠানিক সভায় যখন কোন একটি স্বীকৃত ভাষায় বক্তৃতা চলতে থাকে তখন অন্যান্য স্বীকৃত ভাষাতেও তার তর্জমা প্রচারিত হয়ে থাকে। যখন বাংলাভাষা জাতিসংঘের অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক ভাষারূপে স্বীকৃতি পাবে তখন সেইসব ভাষা থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে সেইসব ভাষায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে তর্জমা ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাভাষার এ হেন ব্যবহারের প্রস্তুতিও "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে"র কাজ হওয়া উচিত।

বর্তমানে যদিও ইনস্টিটিউটের প্রাথমিক কাজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন এবং পৃথিবীর ভাষাসমূহের নমুনা প্রদর্শনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে তবে এর কাজ আরও বিস্তৃত ও ফলপ্রসূ করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে একটি প্রকৃত স্বায়ত্তশাসিত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানরূপে দাঁড়াতে হবে; না হলে এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারবে না।

বাংলাদেশের নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কামাল চৌধুরী

> When you lose a language, you lose a culture, intellectual wealth, a work of art.
> It's like dropping a bomb on the Louvre.
>
> – Linguist Ken Hale

ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম-কানুনের মধ্যে আবদ্ধ শব্দ বা ধ্বনির সমাহার নয়। ভাষা সংস্কৃতির প্রধান বাহন—যুগপৎ মানব-বৈচিত্র্য ও ঐক্যের প্রতীক। বিবর্তনের পথে ভাষার উদ্ভব হয়েছে, কালের বিবর্তনে পরিবর্তিত হয়েছে ও হারিয়ে গেছে অনেক ভাষা, আবার নতুন রূপ পেয়েছে অনেক ভাষার আদিরূপ। ভাষা মূলত মানবসভ্যতার গতিময় অভিজ্ঞান। ভাষার মাধ্যমে মানুষের আত্মা কথা বলে।

ভাষা মূলত মানব সভ্যতার গতিময় অভিজ্ঞান। ভাষার মাধ্যমে মানুষের আত্মা কথা বলে।

পৃথিবীতে কতগুলো ভাষা আছে তার সংখ্যা নিয়ে মতান্তর আছে। নৃবিজ্ঞানী Wade Davis সাত হাজার কথ্যভাষার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ইউনেস্কো-র পরিসংখ্যানে এর সংখ্যা ছয় হাজার। Wade Davis সাত হাজার ভাষার মধ্যে অর্ধ-সংখ্যক ভাষা আগামী এক বা দুই প্রজন্মের সময়কালে হারিয়ে যাবে বলে উল্লেখ করেছেন। ইউনেস্কো-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিপন্ন ভাষার সংখ্যা ২,৫০০টি। বিপন্ন ভাষার তালিকায় প্রথমে আছে ভারতের ভাষাগুলো—সে দেশের ১৯২টি ভাষা বিপন্ন। এভাবে বিভিন্ন দেশের বহু ভাষা বিপন্ন ভাষার তালিকাভুক্ত আছে। পৃথিবীতে বহু ভাষা আছে যেগুলোর কথক সংখ্যা স্বল্প। প্রাচীন কোনো জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রজ্ঞা ও জ্ঞান নিয়ে হয়তো বেঁচে আছে একজন মানুষ। বলা হয়, এক পক্ষকালে (Fortnight) একজন বৃদ্ধ মৃত্যুবরণ করছে—তার সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে প্রাচীন কোনো জনগোষ্ঠীর সর্বশেষ ধ্বনি। ভাবুন, আপনি নিজের ভাষায় কথা বলার জন্য একটি লোকও খুঁজে পাচ্ছেন না। তখন আপন মনে স্বগতোক্তি করা ছাড়া স্বভাষায় কথা বলার আর কোনো উপায় নেই। এভাবেই সর্বশেষ ব্যক্তির সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে ভাষা ও সংস্কৃতি—মানব-বৈচিত্র্যের বিশেষ এক দিক। ভাষা-বিলুপ্তির বিভিন্ন কারণ রয়েছে।

ধারণা করা হয় যে, পৃথিবীতে বর্তমানে কথিত ভাষার মধ্যে ৯০% ভাষা ২০৫০ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিলুপ্ত হবে। বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবও এর অন্যতম দিক। ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে বিভিন্ন দেশে ভাষা-হত্যা (Linguicide) হয়েছে। ভাষা-বিলুপ্তির এই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশে ভাষা-পুনরুজ্জীবনেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বিলুপ্তপ্রায় বহু সংস্কৃতি, বহু লিপি ও বর্ণমালা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা

বাংলাদেশে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এ দেশে অনেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। আমাদের দুর্ভাগ্য, এসব জাতি-গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে লেখালেখি হলেও সামগ্রিকভাবে কোনো নৃতাত্ত্বিক গবেষণা হয়নি। ফলে এদের সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত সেন্সাস রিপোর্ট ও গবেষণাপত্রের পরিসংখ্যানে ভিন্নতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে পিটার বার্টেচি (১৯৮৪)-র কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি এসব জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১২টি বলে উল্লেখ করেছেন। এ জি সামাদ (১৯৮৪) বলেছেন ১৫টি, ১৯৯১ সালের জনশুমারি (Census)-তে এদের সংখ্যা ২৯ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে কিবরিয়া-উল-খালেক (১৯৯৫)-এর মতে, এ সংখ্যা ২৪-এর অধিক। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির *Indigenous Communities* শীর্ষক গ্রন্থে ৪৫টি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। সৌরভ সিকদার (২০১০) মনে করেন, বাংলাদেশে বাঙালি ছাড়াও ৪৫টি নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে। তাঁর মতে, এরা পৃথিবীর প্রধান ৪টি ভাষা পরিবার (অস্ট্রো-এশিয়াটিক, চীনা-তিব্বতি, দ্রাবিড় ও ইন্দো-ইউরোপীয়)-এর ৩০টি ভাষা ব্যবহার করে। এর মধ্যে কিছু ভাষাকে উপভাষা যেমন–রাখাইন, তঞ্চঙ্গা, হাজং ইত্যাদি হিসেবে উল্লেখ করে তিনি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন ২৬টি। বাংলাভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে এসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা প্রধানত চীনা-তিব্বতি বা তিব্বতি-বর্মি ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত (যেমন–গারো, ককবোরক, কোচ, রাজবংশী, মণিপুরি ইত্যাদি)। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চাকমারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবাভুক্ত বলে ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন। বাংলাদেশের অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিবারভুক্ত ভাষাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খাসিয়া, সাঁওতালি ও মুণ্ডা। খাসিয়া-র নিজস্ব লিপি বা বর্ণমালা নেই। বর্তমানে রোমান হরফে এ ভাষা লেখা হয়। সাঁওতালি ও মুণ্ডা ভাষারও নিজস্ব বর্ণমালা অনুপস্থিত। অধুনা রোমান হরফে এ ভাষা লেখা হচ্ছে। বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে বসবাসকারী গারো বা মান্দি-রা আচিক ভাষায় কথা বলে। এদের আলাদা ভাষা রয়েছে, তবে এ ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা না থাকায় এর লিখিত রূপে রোমান ও সীমিত পর্যায়ে বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতের মেঘালয়ের গারোরা নিজেদের ভাষায় লেখাপড়া করছে। কোচ ও রাজবংশীদেরও নিজস্ব লিপি নেই। বাংলাদেশে দ্রাবিড় ভাষা-পরিবারের একমাত্র সদস্য ওরাঁও বা কুড়ুখ। এ ভাষারও বর্ণমালা নেই। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাগুলোর কয়েকটি যথা খুমি, পাংখোয়া, ঠার ইত্যাদি বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। এসব নৃ-গোষ্ঠী বর্তমানে রোমান হরফ ব্যবহার করছে, ক্ষেত্রবিশেষে বাংলা হরফে তাদের ভাষা লেখা হচ্ছে। কিছু জনগোষ্ঠী তাদের ভাষাকে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় রত আছে বাংলা বা রোমান হরফে তাদের ভাষা শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে। চাকমা, গারো, ককবোরক, বিষ্ণুপ্রিয়া, মণিপুরি, রাখাইন ইত্যাদি ভাষায় বর্তমানে উন্নতমানের সাহিত্য রচিত হচ্ছে।

ভাষাবিজ্ঞানে মুখের ভাষাকেই জীবন্ত ভাষা বলা হয়েছে। কিন্তু ভাষা বলতে মৌখিক ও লিখিত–উভয় ভাষাকেই বোঝায়। ভাষার লিখিত ব্যবস্থা না থাকলে তা স্থায়ী হয় না। আমরা ভাষাবিকাশের যে কথা বলি তা লিখিত ভাষা। ভাষা লিখিত না হলে তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে স্থান পায় না। তাছাড়া মুখের ভাষার আয়ু তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। নানা কারণে একালে বহু ভাষা ক্রমশ বিপন্ন (Endangered) হয়ে পড়ছে। অনেক ভাষার এরই মধ্যে মৃত্যু হয়েছে। কোনো মৌখিক ভাষার শেষ ভাষাভাষীর মৃত্যু হলেই ভাষাটি লুপ্ত হয়। ভাষার মৃত্যুর অর্থ ঐ ভাষিক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ভূয়োদর্শন, দর্শন, মূল্যবোধের মৃত্যু। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বৃহত্তর অর্থে মানবসভ্যতা। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর ভাষাসমূহের অনেকগুলোর লিখনব্যবস্থা আছে। এগুলোকে বলা যেতে পারে সাক্ষর (Literate) ভাষা। যেমন–চাকমা, গারো, বিষ্ণুপ্রিয়া, মণিপুরি ইত্যাদি। অনেকগুলোর লিখনব্যবস্থা নেই। কিছু ভাষার লিপি দুটি—বাংলালিপি ও রোমান লিপি। কিছু ভাষাভাষী কেবলই বাংলালিপি গ্রহণ করেছে, যেমন মণিপুরি (বিষ্ণুপ্রিয়া)। কিছু ভাষাভাষী কেবল রোমান লিপি ব্যবহার করে। কিছু ভাষাভাষী তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-আশ্রয়ী বর্ণমালা বা লিপি গ্রহণে আগ্রহী। তবে আমরা মনে করি, অনক্ষর ভাষার লিখনব্যবস্থা প্রবর্তন, মৃত বা প্রায়-মৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন কিংবা সকল জীবন্ত ভাষার বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুসমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ প্রদান করছেন
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি

আধুনিক রাষ্ট্রমাত্র বহুত্ববাদী। মানবকল্যাণ ও উন্নয়ন সকল রাষ্ট্রের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। রাষ্ট্রীয় দর্শন অনুযায়ী সব দেশের সকল নাগরিক সমান অধিকার ও মর্যাদার অধিকারী। রাষ্ট্রের দায়িত্ব সকলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়তা করা। রাষ্ট্রীয় শিক্ষাকার্যক্রম ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয় সকল নাগরিকের কল্যাণার্থে। নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষভাবে সহায়ক হয়; এর ফলে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়। তখন আপাতভাবে পিছিয়ে-পড়া গোষ্ঠীগুলোও মূল উন্নয়ন-স্রোতে সম্পৃক্ত হতে পারে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং এদেশের সংখ্যাগুরু ভাষিক সম্প্রদায় হলো বাঙালি। কিন্তু বাংলাদেশ এক ভাষিক দেশ নয়। এ জনপদে বাঙালি ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ বাস করে এবং তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। এসব নৃ-গোষ্ঠীর ভাষিক বাস্তবতা সম্পর্কিত তথ্য অপর্যাপ্ত। এ অবস্থায় স্বভাবত মত-পরম্পরা পল্লবিত হয়েছে। বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা সম্পাদিত হলে এ জাতীয় বৈষম্য ও মতভেদের অবসান ঘটবে। তখন ভাষাপকিল্পনা-পদ্ধতি অনুযায়ী এসব ভাষার বিকাশ সাধন এবং নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও সার্বজনীন ভাষিক অধিকার ঘোষণাতেও তা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে সরকার এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ শুরু করেছেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বাংলাদেশের নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর ভাষাসমীক্ষা সম্পাদন এবং এসব ভাষা সংরক্ষণ (Documentation) করে ভাষাসমূহের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং ক্ষেত্রবিশেষে পুনরুজ্জীবন (Revitalization) সাধনই এ কর্মসূচি গ্রহণের মৌল অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য।

ভাষাসমীক্ষা : দেশে ও দেশান্তরে

আমাদের জানা মতে, উপমহাদেশের ভাষাগুলোর সমীক্ষায় প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন ব্রিটিশ সরকারের কর্মকর্তা ও বিশ্বখ্যাত ভাষাপণ্ডিত স্যার আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন। তাঁর এ সমীক্ষা *The Linguistic Survey of India* হিসেবে সমধিক পরিচিত। তিনি এ কাজ শুরু করেন ১৮৯৪ সালে আর তা শেষ হয় ১৯২৮ সনে। গ্রিয়ার্সনের সমীক্ষায় ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়সহ উপমহাদেশের মোট ৩৬৪টি ভাষা ও উপভাষার পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে। এর ৫ম খণ্ডের ১ম ভাগ (Vol. V., Part I)-এ বাংলা ভাষার পরিচয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, গ্রিয়ার্সনের ভাষাসমীক্ষার পুরোটাই ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে পিডিএফ আকারে রক্ষিত আছে এবং এ লাইব্রেরির সাউন্ড আর্কাইভে ভাষা ও উপভাষাগুলোর লিপিমূল (Grapheme) ও ধ্বনিমূল (Phoneme)-এর উচ্চারণ সংরক্ষিত রয়েছে।

এর দীর্ঘকাল পর ভারতের ভাষাগুলোর সমীক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৮৪ সনে। ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল অ্যান্ড সেন্সাস কমিশন এ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯১ সনে এ কাজ সমাপ্ত হয়। এ সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের মাতৃভাষা (Mother Languages)-র সংখ্যা ১,৫৭৬টি। কিন্তু সমীক্ষাটিতে বিশেষজ্ঞগণের প্রত্যাশা অনেকটাই অপূর্ণ থেকে গেছে। তাঁরা আরো ব্যাপক ও বৃহৎ পরিসরে ভাষাসমীক্ষা সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। সে-অনুযায়ী ভারত সরকার একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (Eleventh Five-Year Plan (2007-12)) ভাষাসমীক্ষার জন্য ভারতীয় মুদ্রায় ২৮০ কোটি (২.৮ বিলিয়ন) রুপি বরাদ্দ করে। মহীশুরের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজেস এ সমীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বগ্রহণ করে। পরিকল্পনা ছিল এ কাজে ভারতের ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয়, ২-হাজার তথ্যানুসন্ধানী বা ভাষাগবেষক এবং ১০-হাজার ভাষাবিজ্ঞানী ও ভাষাবিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করবেন। সে অনুযায়ী কাজও শুরু হয়। কিন্তু তা পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি। এর কারণ বিবিধ। এর মধ্যে দুটো বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, বিরূপ আবহাওয়া ও বৈরীপ্রকৃতি। ভারতে এমন অনেক ভাষাঞ্চল রয়েছে যেগুলোতে গিয়ে ও অবস্থান করে গবেষকদের পক্ষে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা বেশ কষ্টকর। দ্বিতীয়ত, কিছু সংস্কৃতি ও সমাজ-কর্মীর বিরোধিতা। তাঁদের মতে, এ জাতীয় সমীক্ষার মাধ্যমে পরোক্ষে ভাষাবাদ (Linguicism) ও ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ (Linguistic Imperialism) প্রশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে ২০১০ সনে নতুন পরিকল্পনায় বিন্যস্ত করে সমীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অগ্রাধিকার পায় হিমালয় অঞ্চলের ভাষাগুলোর সমীক্ষা। এছাড়াও উল্লেখ্য যে, ভারতে প্রতিটি জনশুমারির সঙ্গে ভাষাশুমারির কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং তা স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়। ভারতের রাজ্যগুলোও ভাষাশুমারি করে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ওড়িশার কথা উল্লেখ করা যায়। ভারতের প্রতিবেশী নেপালেও ভাষাসমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে (১৯৫২-৫৪) এবং তা হালনাগাদ করার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে নেপালের মাতৃভাষা, নৃভাষা সম্পর্কিত তথ্য সহজেই পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে প্রতি ১০-বছর অন্তর জনগণনা বা আদমশুমারি হয়ে থাকে এবং তা প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভাষাশুমারি জাতীয়ভাবে করা হয়েছে এমন তথ্য আমাদের জানা নেই। তাছাড়া এসব শুমারিগ্রন্থে ভাষাবিষয়ক যেসব তথ্য আছে সেগুলো পর্যাপ্ত নয় এবং সেগুলো গ্রহণ করতেও গবেষকগণ দ্বিধাপন্ন। এক সময় প্রতিটি জেলা থেকে ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার প্রকাশিত হতো। এসব গেজেটিয়ারে জেলার অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে ভাষিক বৈচিত্র্যের পরিচয়ও প্রদান করা হতো। বর্তমানে এগুলো প্রকাশিত হচ্ছে না, হলেও অনিয়মিত। যাই হোক, জেলার প্রশাসনিক এসব তথ্য নির্ভরযোগ্য হলেও সাংস্কৃতিক বিশেষত ভাষাবিষয়ক তথ্য প্রামাণিক বলে মানতে বিশেষজ্ঞরা কুণ্ঠা বোধ করেন।

বাংলাদেশে নৃবৈজ্ঞানিক ভাষাসমীক্ষা কর্মসূচি : প্রস্তাব গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের নৃ-গোষ্ঠীগুলোর নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা (Ethno-Linguistic Survey of Bangladesh) কার্যক্রম পরিচালনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির পর ১২ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে এ বিষয়ে একটি সভা আহ্বান করা হয়। শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, বাংলা ও ইংরেজি বিভাগের সভাপতি, ভাষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায়

প্রস্তাবিত ভাষাসমীক্ষা সম্পাদনের গুরুত্ব ও অনিবার্যতা সকলেই উপলব্ধি করেন। সভায় সকলে মত প্রকাশ করেন যে, এ কাজ অতিদ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এছাড়াও সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

- ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার জন্য প্রথমে একটি চেকলিস্ট সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে তৈরি করা হবে।

- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, বাংলা, ভূগোল ও পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সমন্বয়ে সমীক্ষাবিষয়ক বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা (Work-Plan) তৈরির দায়িত্ব পালন করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ।

- দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান/চেয়ারপার্সনকে পত্র দিয়ে (উপাচার্য মহোদয়কে অবহিত করে) কোন্ কোন্ এলাকায় তাঁরা কাজ করতে আগ্রহী এবং এজন্য কতজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নিয়োজিত হবেন, সম্ভাব্য ব্যয় এবং ব্যয়ের কতটুকু অংশ তাদের বিভাগের পক্ষে বা স্থানীয়ভাবে বহন করা সম্ভব এবং সরকারিভাবে কত টাকা প্রয়োজন ইত্যাদি জানতে চেয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক একটি পত্র প্রেরণ করবেন।

- সমীক্ষাটি কর্মসূচি (Programme) হিসেবে সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট তা তৈরি করবে।

- সমীক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাবৈজ্ঞানিক ও নৃবৈজ্ঞানিক বিবরণী (Linguistic and Ethnographic Account)— দুই-ই গুরুত্ব পাবে।

- আগামী ১ (এক) বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের সকল নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাবৈজ্ঞানিক বৃত্তান্ত (Linguistic Profile) তৈরি করবে।

উল্লিখিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান/চেয়ারপার্সনকে (উপাচার্য মহোদয়কে অবহিত করে) পত্র প্রদান করা হয়।

পূর্ববর্তী সভার ধারাবাহিকতায় ১১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে শিক্ষাসচিবের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা (Ethno-Linguistic Survey) বিষয়ক দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমীক্ষাটি কীভাবে সম্পন্ন হতে পারে সে-বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাইফুর রশীদ ও বিভাগীয় শিক্ষক ড. হাসান আল শাফী একটি পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা প্রদর্শন করেন। এ সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

- সমীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য সম্ভাব্য দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি মূল কমিটি (Core Committee) গঠন করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এ কমিটি ও কর্মসূচির উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের একজন পরিচালক সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করবেন। এ কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় পরিসরসহ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের একটি কক্ষ বরাদ্দ করা হবে। কক্ষটি হবে উক্ত কর্মসূচির অফিসকক্ষ এবং এতে বিশেষজ্ঞদের কর্মসম্পাদনের সুযোগও থাকবে;

- মূল কমিটির পাশাপাশি একটি সাধারণ কমিটি গঠন করা হবে। এতে বিশেষজ্ঞগণসহ বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত হবেন;

- সমীক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের পাশাপাশি বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি/ইনস্টিটিউট/কেন্দ্র সম্পৃক্ত হবে;

- যেসব বিষয় নিয়ে ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা সম্পন্ন হবে তার একটি সম্ভাব্য চেকলিস্ট আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. সৌরভ সিকদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

‘গীতাঞ্জলি’র শতবর্ষ ও আমাদের অর্জন ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’

রশীদ হায়দার

১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ জানতে পারলেন তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। রয়টারের টেলিগ্রামে উল্লেখ ছিলো : Stockholm, Thursday, Nov. 13/ The Nobel Prize for Literature 1913 has been awarded to the Indian Poet Rabindranath Tagore.

সাল ১৩, তারিখও ১৩, বিশ্ববিদ্বজ্জন জানতে পারলেন পরাধীন ভারত উপমহাদেশে ‘বাংলা’ নামে একটি ভাষা আছে, সেই ভাষার একজন কবি আছেন, যিনি অচিরেই ‘বিশ্বকবি’ হিসেবে অভিহিত হবেন। উল্লেখ্য, ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিলো ৮,০০০ পাউন্ড।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রতি বিশ্ব চেয়ে আছে, এমন উক্তি মনে হয় এখন আর অত্যুক্তি নয়।

আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ১০০ বছর উদ্‌যাপন করছি এবং গর্বভরে স্মরণ করছি–তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা। আমাদের গর্বের মাত্রা আরো বেড়ে যায় যখন দেখি জমিদারি-সূত্রে রাজশাহী জেলার পতিসর, কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও পাবনা জেলার শাহজাদপুরে দশ বছরের অধিক সময় অবস্থান করে পূর্ববঙ্গকে নতুনরূপে তিনি আবিষ্কার করলেন; ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর ‘আমার সোনার বাংলা’ লিখে বাংলার এই অঞ্চলকে ভিন্ন সৌন্দর্যে যে ভূষিত করলেন, তা যেন চিরকালের জন্যে আমাদের নিজস্ব অলঙ্কার হয়ে রইলো।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয় হলেও প্রকৃতপক্ষে জয় হয় বাংলাভাষার, তথা বাংলা সাহিত্যের। এরই ধারাবাহিকতায় বলা যায়, বাংলাভাষা আজ বিশ্বসভায় একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে; আশা করা যায় অচিরেই এর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মিলবে। এই অর্জন বাঙালি জাতির; বাংলাদেশের। কাজেই দাবি করে বলা যায়, ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে যখন বাংলায় বক্তৃতা করলেন, তখন বাংলাভাষার বিজয় কেতন যেমন উড্ডীন হলো, তেমনি এই ভাষার প্রতিষ্ঠা; প্রতিষ্ঠা লাভের ইতিহাস, ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত রক্ত মিলেমিশে একাকার হয়ে এই সত্যই প্রমাণ করলো যে–বর্ষায় নরম ও গ্রীষ্মে কঠিন মাটির ভীরু-ভেতো-অলস-কর্মবিমুখ এই জাতি প্রয়োজনে কী ভয়ঙ্কর ও দুর্দমনীয় হয়ে উঠতে পারে–১৯৭১ তার প্রমাণ।

এই প্রমাণের সূচনা কিন্তু ভাষার প্রশ্নেই। প্রয়াত কবি শামসুর রাহমান ‘আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’-র জন্যে যে শোকগাথা রচনা করেছিলেন, তা মূলত ছিলো বাঙালির সাহসনামা। দেশভাগের পর একে একে প্রমাণ পেশ করলে এই সত্যই প্রতীয়মান হবে, বাঙালি জাগলে বিজয় না নিয়ে ঘরে ফেরে না।

১৯৪৭-এর ডিসেম্বর মাস। করাচিতে এক আলোচনা সভায় এমন সিদ্ধান্ত হয় যে, পাকিস্তান গণপরিষদের ব্যবহার্য ভাষা হবে উর্দু এবং ইংরেজি। নির্মম

সত্য হচ্ছে, গোটা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬% মানুষই বাংলাভাষী। ইংরেজের শাসন আর নেই, আর উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই ভাষা নয়, কিন্তু সেই উর্দুই ভাষার প্রশ্নে প্রভুত্ব করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। এই ধারণার উদ্গাতা হলেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর জিয়াউদ্দিন। তার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর যুক্তি পরিষ্কার–সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষাই হবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। ১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে করাচিতে গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে অতিদ্রুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় যে সভা হয়, সেখানেও বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবির প্রতি অটল থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

উর্দুকে পাকিস্তানের যে রাষ্ট্রভাষা করা হবে তার প্রাথমিক প্রস্তুতির কথা আমরা জেনে যাই ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ সালে। করাচিতে অনুষ্ঠিতব্য গণপরিষদে ব্যবহার্য ভাষা কী হবে, তা নিয়ে যখন কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রশ্ন তোলেন :

Mr. President, Sir, I move :

"That in sub-rule (1) of rule 29, after the word 'English' in line 2, the words 'or Bengalee' be inserted."

উল্লেখ্য, শব্দ–sound অর্থে নয়; নির্দোষ সামান্য শব্দও কখনও কখনও যে কর্ণবিদারী হয় তার প্রমাণ আমরা পাই মুহূর্তেই। সংসদের দলনেতা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান 'or Bengalee' শুনেই যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তা দেখে ইতিহাসই পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয় যে, সদ্যলব্ধ এই দেশের অখণ্ডতার ইতিহাস কতো ঠুনকো, কতো ভঙ্গুর। এর স্থায়িত্ব ২৪ বছরও নয়। লিয়াকত আলী খান সংসদীয় শালীনতা ঝেড়ে ফেলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে 'ভারতীয় চর', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'কমুনিস্ট' ইত্যাদি নামে অভিহিত করলেন। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, লিয়াকত আলী খানের জন্ম ভারতের উত্তরপ্রদেশে; পাকিস্তানে উদ্বাস্তু হয়ে এলেও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচন করার জন্যে কেউ তাকে আসন ছেড়ে দেয়নি; যেটি দেয়া হয়েছিলো পূর্ববঙ্গেই। অথচ পূর্ববঙ্গের মূল ভাষার সঙ্গে তিনিই সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

উল্লেখ করতেই হবে, মুসলিম লীগের কোনো বাঙালি সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সমর্থনে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি, লিয়াকত আলী খানের বক্তব্যের সামান্য একটু প্রতিবাদও না।

ভাষার প্রশ্নে পূর্ববঙ্গবাসী যে কতোটা স্পর্শকাতর তার প্রমাণ আমরা পাই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাতনি আরমা দত্তের 'আমার দাদু' শীর্ষক একটি রচনার শেষাংশে। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত '*স্মৃতি : ১৯৭১*' তৃতীয় খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায় আরমা লিখছেন:

"প্রথম গণ-পরিষদ অধিবেশন শেষে করাচী থেকে ফিরলাম। অনুন্নত তেজগাঁ বিমান বন্দরে সিকিউরিটি বলতে কিছুই নেই। প্লেন থেকে নেমে দেখলাম, প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশজন যুবক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। তাদের প্রত্যেকের গায়ে চাদর। আমার ধারণা হলো, গণ-পরিষদে বাংলার সপক্ষে কথা বলার দরুণ এরা বিক্ষোভ জানাতে এসেছে, এদের চাদরের আড়ালে অস্ত্রও থাকতে পারে। সংশয় নিয়ে এগিয়ে গেলাম। যখন ওদের একেবারে নাগালের মধ্যে চলে গেছি তখন হঠাৎ প্রত্যেকে চাদরের তলা থেকে রাশি রাশি ফুল বের করে আমার ওপর বর্ষণ করতে লাগলো। ওরা সবাই ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।"

সাধারণ্যে যদি প্রশ্ন করা হয়, ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত কবে থেকে? অধিকাংশ ব্যক্তিই জবাব দিবেন ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। যেমন ১৯৭১ আমাদের নিকট বর্ষপঞ্জির একটি সাল মাত্র নয়; তেমনি ২১শেও শুধু একটি তারিখ নয়। মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠী বুঝতে চেষ্টা করেনি ভাষার প্রশ্নে যেখানে একটি জাতির অস্তিত্ব জড়িত, সেই ভাষার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তার পরিণাম কী হতে পারে! ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়; বর্তমানে 'লীগ' অবলুপ্ত বললেও মনে হয় বাড়িয়ে বলা হয় না।

শাসকগোষ্ঠীর বোধোদয়ের মধ্যেও একটা ছলচাতুরি পরিলক্ষিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে তথাকথিত ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও শর্ত দেওয়া হয়, ১০ বছর পর এর ব্যবহারিক কার্যক্রম শুরু হবে। স্পষ্ট না বললেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, মাঝের ১০ বছরে উর্দুর ব্যাপক ব্যবহার হবে; প্রচার চালানো হবে; আরবির মতো ডানদিক থেকে লেখার নিয়ম বলে মুসলমানি চরিত্র

বজায় থাকবে; আরবি অক্ষরের সঙ্গে চেহারায় মিল থাকার সুবাদে ইসলামি বই-পুস্তক পাঠ বৃদ্ধি পাবে, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি ভাষার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক বাড়বে; উর্দু-আরবি শব্দ ব্যবহারের আধিক্যে ইসলামি জোশ জোরদার হবে এবং ভাষা হিসেবে বাংলা যে কতো দুর্বল তা প্রমাণের যথেষ্ট সুযোগ মিলবে।

সুযোগ যে মিলবে তার প্রমাণ আমরা বাঙালি নামধারী কিছু শিল্পী-সাহিত্যিকের কর্মের মধ্যেই স্পষ্ট লক্ষ করছিলাম। উর্দু-আরবি-ফারসি শব্দের অকারণ ও ইচ্ছাকৃত ব্যবহারে বাংলা তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য হারাতে বসেছিলো; জনৈক অধ্যাপক কবি তাঁর কবিতায় ইসলামি ভাবধারাকে প্রাধান্য দিতে এমন কথাও লিখেছিলেন :

ওরে আমার পাকিস্তানের বধূ

বেহেশত থেকে বিচি এনে বুনবো আমি কদু।

আমরা ভুলে যাই না যে, পাকিস্তানি ও ইসলামি আদর্শ সমুন্নত রাখতে, উজ্জ্বল করতে প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকেও বর্জন করার কথা বলেছিলেন একজন ইংরেজি সাহিত্যের বাঙালি অধ্যাপক; ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন রেডিও পাকিস্তান ও পাকিস্তান টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে যে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, তাতে স্পষ্টত রবীন্দ্র-সমর্থক ও রবীন্দ্রবিরোধী দুটো দল যেন মুখোমুখি অবস্থানে চলে যায়। রবীন্দ্র-সমর্থকদের জন্যে জমা হয় নানান জয়ের মালা; আর বিরোধীদের জন্যে শুধু ধিক্কার ধ্বনি।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রেও ছিলো দ্বিমুখী আচরণ। ভারত বিভাগ পূর্বকালে তাঁকে যেমন রাজদ্রোহী বিবেচনায় কারাভোগ করতে হয়েছে, তেমনি মোল্লা-মৌলবি-ধর্মব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পেতে হয়েছে 'কাফের' ফতোয়া; এমনকি 'লোকটি মানুষ, না শয়তান' এমন অভিযোগের সম্মুখীনও হতে হয় তাঁকে।

ভাষা যে অপরিসীম শক্তির আধার–তা পাকিস্তানিরা বুঝতে ভুল করেনি বলেই ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ তারা কামানের গোলা বর্ষণ করে বাংলা একাডেমী ও শহীদ মিনারের উপর। ধ্বংস করতে চেয়েছিল বাঙালির অনুপ্রেরণার এই উৎস দুটিকে। তবে তারা উৎস দুটিকে আহত করেছে মাত্র; ধ্বংস করতে পারেনি।

অবশ্য উল্লেখযোগ্য, আইয়ুবের নির্মম শাসনামলেও ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করেছে বাঙালিরা; ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' পালন করে প্রমাণ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎসটি কোথায় নিহিত।

বাংলার যা কিছু অর্জন তা ম্লান বা অস্বীকার কিংবা অবমূল্যায়ন করার ফলেই আমরা দেখতে পাই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ভূমিধ্বস জয়লাভের পরও অল্পকিছু দিন পরই কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-'ক' ধারা প্রয়োগ করে পূর্ববাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়; ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবরে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলে আঘাত করাই শুধু নয়, বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, আইয়ুব বাঙালিদের ১০ বছর গোলাম বানিয়ে রেখেছিলো; ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে দু'জন নিহত; ১৯৬৪ সালের মোনেম-সবুরের চক্রান্ত ও পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি; সংবাদপত্রে 'পূর্বপাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' আহ্বান; ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধে পূর্বপাকিস্তানের সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থা; ১৯৬৬ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা দাবি উত্থাপন; ওই সালেরই ২০ মার্চ আইয়ুবের 'অস্ত্রের ভাষায় এর জবাব দেওয়া হবে' হুমকি ইত্যাদি পাকিস্তানের ইতিহাসকেই বিপন্ন করে তোলে।

এর মধ্যে আমরা দেখেছি আরবি হরফে বাংলা লেখা, রোমান হরফে বাংলা, 'সওজ' বাংলা ইত্যাদি প্রচলনের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালের ৩১ আগস্ট, ৪১ জন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর 'বাংলা হরফের রদবদল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি করবে' বিবৃতি জনগণকে উদ্বিগ্ন করে।

ভাষার প্রশ্নেই দেশের জনগণের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব যখন প্রবল হয়ে দেখা দেয়, তখনই প্রশ্ন আসে, মানুষ ভাষা ছাড়া বাঁচে কীভাবে? নিজ ভাষার সম্পদ ও সম্মান রক্ষার অধিকার পৃথিবীর প্রতিটি দেশের, প্রতিটি মানুষের রয়েছে। এই উপলব্ধির চরম মূল্য আমরা দিয়েছি পুরো পাকিস্তানি শাসনামলে; ১৯৫২ ও ১৯৭১

অভিভাবকের মতো আমাদের হাত ধরে নিয়ে গেছে সংগ্রামের অগ্রভাগে; যুদ্ধের পুরোভাগে; বিজয়ের বেদীতে। নিঃসন্দেহে ওই সব উপলব্ধিই অনুপ্রাণিত ও আবেগতাড়িত করে সুদূর কানাডা প্রবাসী দু'জন বাঙালিকে। এর মূলে দু'জন বাঙালি মনীষীর উপলব্ধি এখানে অবশ্য উল্লেখ্য :

১. "১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে 'কৃষ্টি' পত্রিকায় ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'বাংলাকে ছেড়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানবাসী গ্রহণ করলে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৃত্যু অনিবার্য।'

২. "১৯৪৮ সালে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, 'পূর্ব বাংলার বাঙালিদের ওপর জোর করে উর্দু ভাষা চাপালে তা পূর্ব বাংলায় গণহত্যার শামিল হবে।' তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়েও বেশি সত্য আমরা বাঙালি।'

(সূত্র: সেলিনা হোসেনের '*মুক্ত করো ভয়*' গ্রন্থের 'বাংলাদেশের ভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩)

যে দু'জন কানাডা প্রবাসী বাঙালির কথা উল্লিখিত হয়েছে তাদের দু'জনের নাম রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম। পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হলে মেনে নিতাম '৫২-র রফিক-সালামই ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ, বাংলা, ফিলিপিনো, ইংরেজি, ক্যান্টোনিস, কাচ্চি, জার্মান, হিন্দি ভাষার দশজন, কানাডার *Mother Language Lover of the World* নামের একটি সংগঠন বাংলাদেশের ২১ ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক পটভূমি উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করে জাতিসংঘে আবেদন জানান : ২১ ফেব্রুয়ারিকে যেন 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ব্যক্তি বা কোনো সংগঠনের প্রস্তাব জাতিসংঘ গ্রহণ করে না; তারা প্রস্তাব দেয় বিষয়টি ইউনেস্কোতে পাঠাতে। ইউনেস্কো জানায় 'এ ধরনের প্রস্তাব ইউনেস্কোর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের যে-কোনো জাতীয় কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত হতে হবে।' এই জবাব পাবার সঙ্গে-সঙ্গে জনাব রফিকুল ইসলাম "টেলিফোনে বিষয়টি প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শিক্ষাসচিব বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের মহাসচিবকে অবহিত করেন। বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রস্তাবটি ইউনেস্কো সদর দফতরে যথাসময়ে পেশ করে।

১৯৯৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ত্রিশতম সাধারণ সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা সংরক্ষণ এবং শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বহুভাষা ব্যবহারে অগ্রগতি অর্জন সম্পর্কিত ইউনেস্কোর নীতিমালার আলোকে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে প্রতি বছর তা বিশ্বের সকল সদস্য রাষ্ট্র ও ইউনেস্কো সদর দফতরে উদ্‌যাপন করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করে। ইউনেস্কোর ২৮টি সদস্য রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রস্তাব লিখিতভাবে সমর্থন করে। দেশগুলো হলো : বেনিন, বাহামা, বেলারুশ, কমোরস, চিলি, ডোমিনিকান রিপাবলিক, মিশর, গাম্বিয়া, হন্ডুরাস, ইটালি, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, আইভরি কোস্ট, লিথুয়ানিয়া, মালয়েশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া, ওমান, ফিলিপাইন, পাপুয়া নিউ গিনি, পাকিস্তান, প্যারাগুয়ে, রাশিয়া, শ্রীলঙ্কা, সৌদি আরব, সুরিনাম, স্লোভাকিয়া ও ভানুয়াতু। *Draft Resolution-35* হিসেবে চিহ্নিত বাংলাদেশের প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর ল্যাংগুয়েজ ডিভিশন রিপোর্ট Advisory Committee on Linguistic Pluralism and Multilingual Education-এর মাধ্যমে বিবেচনার জন্য একজিকিউটিভ বোর্ডে প্রেরণের পক্ষে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন। দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সাধারণ সম্মেলনে প্রস্তাবটির উপস্থাপন যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেজন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পূর্বেই তা সাধারণ সম্মেলনে উপস্থাপনের পক্ষে মহাপরিচালকের পরিবর্তিত অভিমত আদায় করে। এরপর ১২ এবং ১৬ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে কমিশন-২ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বাংলাদেশের প্রস্তাবটি পাশ করা হয় ও সাধারণ সম্মেলন অধিবেশনে উপস্থাপন করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

১৭ নভেম্বর সাধারণ সম্মেলনের অধিবেশনে সকল সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে তা প্রতি বছর

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করছেন
শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

সকল সদস্য রাষ্ট্র ও ইউনেস্কো সদস্য দফতরে উদ্‌যাপন করার জন্য বাংলাদেশের প্রস্তাব গৃহীত হয়।"

(সূত্রঃ সেলিনা হোসেনের 'মুক্ত করো ভয়' গ্রন্থের 'ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬)

লক্ষণীয়, যে-পাকিস্তান ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটায়, সে-ই পাকিস্তানও বাংলাদেশের প্রস্তাব লিখিতভাবে সমর্থন করে।

এই অর্জনের যথার্থতা অক্ষুণ্ন, প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের মূল দায়িত্ব কিন্তু বাংলাদেশের। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অল্প কিছুদিন হয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের পেছনে রাজনৈতিক খেলা চলেছে, মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে সাতটি বছর এর নির্মাণ কাজ বন্ধ রেখে, বলা চলে জাতিসংঘের তদানীন্তন মহাসচিব কফি আনানকেও অবমাননা করা হয়, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম শাসনামলে যার সূচনা; দায়টা যেন তাঁর একার, ফলে পূর্ববর্তী সরকারের আমলে এলাকাটি প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে যায়।

আমরা কৃতজ্ঞ প্রয়াত শিক্ষামন্ত্রী এ.এস.এইচ.কে. সাদেক, প্রাক্তন শিক্ষাসচিব বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ ও প্যারিসে ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী-র নিকট, কারণ নিয়মের মধ্যে থেকেই অনিয়ম করে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তাঁরা প্রস্তাবটি ইউনেস্কোতে পেশ করেন। আমাদের 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' স্বীকৃত হয়, প্রতিষ্ঠা পায়।

আমরা শুরু করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির ১০০ বছর পূর্ণতা নিয়ে। কেন রবীন্দ্রনাথকে এই পুরস্কার দেওয়া হলো প্রশ্নে আমরা কবি W. B. Yeats-এর শরণ নিতে পারি। অনূদিত 'গীতাঞ্জলি'-র "ভূমিকায় ইয়েট্‌স্ জানিয়েছেন গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি পড়ে তিনি কীরকম গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপিটি তিনি ট্রেনে, বাসে, রেস্তোরাঁয় সুযোগ পেলেই পড়তেন এবং পরিচিত কাউকে দেখলেই লুকিয়ে ফেলতেন, পাছে তাঁর ভাবাবেগ আর কারো চোখে পড়ে। তিনি জানিয়েছেন, তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জানবার মতো ইংরেজিতে তাঁদের দেশে কোনো বই ছিল না। তাঁর জানবার একমাত্র উপায় ছিল প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে শোনা এবং কবির লেখা পাঠ করা।/ অথচ সেটুকুর ওপর ভরসা

করেই কবির জীবন ও কাব্য সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকার একটি পরিচিতি ইয়েট্‌স্ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর এই ভূমিকায়। তিনি বলেছেন, "এই গানগুলোর মধ্যে যে ভাবজগতের ছবি বিধৃত হয়েছে, আমি সারাজীবন তারই স্বপ্ন দেখেছি।" আরো বলেছেন, "প্রজন্মক্রমে ভ্রাম্যমাণ পথিক থেকে নদীর মাঝি পর্যন্ত সবাই গুন গুন করে এ গান গাইবে।"/ তিনি যখন বলেন, "এখানে কথিত গেরুয়া বসন পরিধান করে গায়ে ধুলো লাগলে বোঝা যাবে না বলে, যুবতী তার শয্যায় তার প্রেমিক রাজপুত্রের মালা থেকে খসে-পড়া পাপড়ি খোঁজে, ভৃত্য বা বধূ শূন্যগৃহে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করে, এ সবই ঈশ্বরের দিকে ধাবমান হৃদয়ের প্রতীক। ফুল আর নদী, শঙ্খধ্বনি, ভারতীয় ঘন বর্ষা অথবা তপ্ত নিদাঘ, এগুলোও মিলনের বা বিরহের বিভিন্ন মেজাজের প্রতিচ্ছবি; আর নৌকোর ওপর বসে যে ব্যক্তিটি বাঁশী বাজান, –রহস্যময়, অর্থব্যঞ্জক চীনা চিত্রপটের মতো, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর," – তখন, একজন বিদেশী কবি, যিনি রবীন্দ্রনাথকে জানতেন না, এদেশের চিন্তাভাবনা সংস্কৃতি সম্পর্কে শুধু লোকমুখে শুনেছেন, তাঁর পক্ষে কতখানি গভীরভাবে গীতাঞ্জলি পাঠ করলে এরকম ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

সুইডিশ একাডেমি ১৯১৩ সালে এর তার বক্তব্যে জানায়, রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে "because of his profoundly sensitive, fresh and beautiful verse, by which, with consummate skill, he has made his poetic thought, expressed in his own English words, a part of the literature of the West." (সূত্রঃ আবদার রশীদ অনূদিত *'নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত 'গীতাঞ্জলি'* গ্রন্থের ভূমিকা।)

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' স্বীকৃতি লাভের পেছনেও মানুষের প্রতি সম্মান, ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা, মাতৃভাষার জন্যে জীবনদান কোনো দেশে এমন চরম গৌরব ও বেদনার মধ্য দিয়ে ঘটেছে, তার তুলনা মেলা ভার।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রতি বিশ্ব চেয়ে আছে, এমন উক্তি মনে হয় এখন আর অত্যুক্তি নয়।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : ভাষা ও সংস্কৃতি

সৌরভ সিকদার

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা কত?–এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। এমনকি সরকারি জনগণনার হিসাবেও এদের প্রকৃত জনসংখ্যার কোনো চিত্র নেই। ১৯৯১ সালের জনগণনার হিসাবে ২৯টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম উল্লেখসহ মোট জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১২,০৫,৯৭৮। এটি নিঃসন্দেহে পূর্ণাঙ্গ তথ্য নয়। ২০১১ সালের জনগণনার হিসাবে ২৭টি আদিবাসীর নাম দেখানো হয়েছে। জনসংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। অন্যদিকে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম প্রকাশিত স্মরণিকায় (২০০৮) ৪৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন গবেষকের মতে এই সংখ্যা প্রায় ৮০।

বাংলাদেশে আদিবাসীরা সরকারিভাবে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' হিসাবে আখ্যায়িত। বাংলাদেশের সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদে বলা আছে–'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন'। অর্থাৎ এদেশের সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয় হবে বাঙালি। বাংলাদেশের জনগণ বা নাগরিক হলেও তারা যে বাঙালি নন, এ সত্যকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে সম্প্রতি সংবিধানের যে পঞ্চদশ সংশোধনী হয়ে গেল, তাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় সংযোজিত হয়েছে ২৩.ক অনুচ্ছেদের মাধ্যমে যা নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক। এছাড়াও এমডিজি, ইএফএ এবং *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*-এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দেখা যায় এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে আইনে যথেষ্ট অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি বহুভাষী ও বহুসংস্কৃতির রাষ্ট্র। এদেশের ৯৭% নাগরিক বাঙালি। কাজেই এখানে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে পড়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে শঙ্কিত না হবার কোনো কারণ নেই যে, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হবার পথে। যদিও এশিয়া তথা বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষণ ও উন্নয়ন করতে ইউনেস্কোর উদ্যোগে (মে ২০১২) ঢাকায় এশিয়া অঞ্চলের সংস্কৃতি মন্ত্রীদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তার ঘোষণাপত্রের মূলসুর ছিলো 'নিজ নিজ দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের রক্ষণ ও উন্নয়ন-এর জন্য কৌশলপত্র প্রস্তুত করা' *(Dhaka Declaration 2012)* সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ বিষয়ে (নৃ-ভাষাতাত্ত্বিক) গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

বাংলাদেশ একটি বহুভাষী ও বহুসংস্কৃতির রাষ্ট্র। এদেশের ৯৭% নাগরিক বাঙালি। কাজেই এখানে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে পড়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

ভাষা

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এই মৌলিক অধিকার থেকে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত, বিশেষ করে মাতৃভাষায় তাদের

শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না থাকায়। পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদেরকে মাতৃভাষা ভালো করে শেখার আগেই বিদ্যালয়ে গিয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলার মাধ্যমে পাঠগ্রহণ করতে হয়। অথচ আই.এল.ও. এর সংশ্লিষ্ট ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে আদিবাসী শিশুদেরকে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করার কথা। তাছাড়া পার্বত্য শান্তিচুক্তির (খ) অনুচ্ছেদের ৩৩নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের অঙ্গীকার করা হয়েছে। এবং ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে বর্তমান সরকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি করেছে এবং এরই মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে নীতি বাস্তবায়নের জন্য কাজ শুরু হয়েছে, যা ২০১৪ সাল থেকে চালু হতে পারবে। এছাড়াও বেসরকারিপর্যায়ে কয়েকটি উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে ৪৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে প্রায় ৩০টি পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাষা হচ্ছে সাঁওতাল, চাকমা, তন্‌চংগ্যা, মারমা, গারো (মান্দি), ত্রিপুরা (ককবোরক), সাদরি (কুড়ুখ), খেয়ায়, খুমি, লুসাই, মুন্ডা, মণিপুরী (মৈতিই ও বিষ্ণুপ্রিয়া), মুরং, পাংখো, পাহাড়ি, খাসিয়া প্রভৃতি। এ ভাষাগুলো পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাপরিবারের সদস্য। যেমন ইন্দো-ইউরোপীয়, সাঁওতাল-অস্ট্রো-এশিয়াটিক, ওরাঁ-দ্রাবিড়ীয়, মারমা-তিব্বতী-বর্মী ইত্যাদি পরিবারভুক্ত। বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব মাতৃভাষা থাকা সত্ত্বেও এরা সবাই তাদের প্রয়োজনে দ্বিতীয় আর একটি ভাষা বিশেষ করে বাংলা জানে বা লিখতে বাধ্য হয়। যেমন সাঁওতাল, চাকমা ও গারোরা। তবে এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তারা তিনটি ভাষা জানে অর্থাৎ এরা বহুভাষী। যেমন বান্দরবানের খুমিরা, মারমা এবং বাংলা জানে। উত্তরবঙ্গের (রংপুর জেলার) অনেক ওরাঁও জানে বাংলা ও সাঁওতালি এবং সাদরি ভাষা। বাংলাদেশের খুব কম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছে যারা শুধু নিজের ভাষা জানে।

সাঁওতাল, চাকমা, মারমা, গারো ও ত্রিপুরা–এই প্রধান পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ছাড়া অন্যদের ভাষার অবস্থা তেমন ভালো নেই। বলা যেতে পারে বিপন্নদশা। ঘরের মধ্যে ছাড়া তাদের মাতৃভাষা চর্চার সুযোগ নেই বললেই চলে। তাছাড়া নতুন প্রজন্মের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সন্তান শিক্ষার সুযোগ কিছুটা লাভ করার কারণে জীবন-বাস্তবতার তাগিদে নিজের ভাষার চেয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা অথবা আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি চর্চাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। সেই সঙ্গে যে সমস্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে শহরে বসবাস করে আসছে পারিপার্শ্বিকতার কারণে বলা যায় তাদের মাতৃভাষা তারা ভুলতে বসেছে।

পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। আমাদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার পরিবর্তন যদি লক্ষ করি তাহলে দেখবো তিন ধরনের পরিবর্তন ঘটছে– (ক) উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটছে, (খ) শব্দভাণ্ডারে বাংলাভাষার সমকালীন শব্দসমূহ ঢুকে যাচ্ছে এবং (গ) অনেকেরই নিজস্ব লিপি না থাকায় মাতৃভাষায় লিখিত সাহিত্য (রচনা) অত্যন্ত সীমিত হয়ে যাচ্ছে। আর যাদের লিপি আছে তারা সে লিপির চর্চা না করার কারণে ভুলে গেছে। যেমন চাকমাদের নিজস্ব লিপি (ওঝাপাতা) থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জনই জানে না বা চেনে না লিপিটি। ফলে ইদানীং যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হচ্ছে তার সিংহভাগই বাংলা হরফে। বিজু (চাকমাদের নববর্ষ উৎসব) উৎসবের সময় রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি থেকে যে সংকলনগুলো প্রকাশিত হয় সেগুলো (যেমন সাঁওতাল, গারো এবং তন্‌চংগ্যা ছাত্র সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।) এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য। তবে উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল এবং ময়মনসিংহের গারোদের একটি অংশ (মিশনকেন্দ্রিক) রোমান হরফে বা অক্ষরে ধর্মীয় গুণকীর্তনমূলক গান-কবিতা প্রভৃতি রচনা করে থাকে। অপেক্ষাকৃত স্বল্প জনসংখ্যার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার অবস্থান আরো খারাপ। ওরাল বা মৌখিক সাহিত্য, যাদুমন্ত্র, ভেষজ চিকিৎসাপ্রণালী ছাড়া সংরক্ষণ উপযোগী আর কিছু রচিত হচ্ছে না বললেই চলে। এভাবে চলতে থাকলে বর্তমান পৃথিবীর ভাষিক বৈচিত্র্যের অসাধারণ নিদর্শন এ ভাষাগুলো হয়তো অচিরেই মুছে যাবে মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ না নিলে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ভাষার তালিকায় একসময় এর অনেকগুলোই যোগ হবে।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ পালনোপক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও আলোচনা সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি, প্রবন্ধকার ও আলোচকবৃন্দ

সংস্কৃতি

সংস্কৃতির অর্থ কর্ষণ বা উৎকর্ষ। সাধারণত সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসগত উৎকর্ষ। সংস্কৃতি হচ্ছে মানবীয় আচারপদ্ধতি, শিক্ষা-দীক্ষা, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব প্রভৃতির সমন্বয়ে এক অপূর্ব মনোভাব। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নিবিড়। মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি, সংস্কার, প্রথা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আনুষ্ঠানিক রূপরেখা ও অন্যান্য যে কোনো বিষয়ে তার জটিল সমাবেশ সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো যে কোনো সমাজ তথা গোষ্ঠীর চিৎপ্রকর্ষের ব্যঞ্জনাময় প্রকাশের সম্মিলিত যোগফল। সমগ্র গোষ্ঠীর চিন্তাধারা, ভাবধারা ও কর্মধারার সফল প্রতিচ্ছবি। কাজেই সংস্কৃতির মুকুরে ধরা পড়ে সমাজের একটি মানস প্রবণতা, সামাজিক অনুষ্ঠানময়তা, শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতা, কর্মবোধের ভাব-প্রেরণা ও ঐতিহ্যের চরম সমুন্নতি, যা মানুষের আনন্দময় অবচেতন মনের সামগ্রিক প্রয়াস তথা যুগ-যুগান্তরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল।

সংস্কৃতির এই বিষয়টি একই সঙ্গে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। সংস্কৃতি, বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার সময় আমাদের মনে রাখা দরকার এর পরিমণ্ডল মঞ্চে নাচ-গান ও অভিনয়ের থেকে অনেক ব্যাপক। মানুষের ভাষা, জ্ঞান, চিন্তা, বিশ্বাস, প্রথা, কর্মকৌশল, আচার-ব্যবহার, অধিকার, নৈতিকতা, উৎসব সবই সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের সংস্কৃতির সুরক্ষা শুধু নৃত্য, গীত কিংবা নাটকের মতো চারুকলাধর্মী তৎপরতা বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি আজ হুমকির মুখে। বিশেষ করে বিশ্বায়নের গ্রাসে তো বটেই, এছাড়াও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিষবাষ্প ও আগ্রাসন, রাষ্ট্রের ঔদাসীন্য ইত্যাদি কারণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। সমতলের বর্মণ, কোচ ইত্যাদি জাতি তাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। পাহাড়ের খিয়াং জাতির ভাষা হারাতে বসেছে। বহু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ হারিয়ে ফেলেছে।

পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রয়েছে বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি, নাচ, গান ইত্যাদি, বিশেষ করে জুমকেন্দ্রিক সংস্কৃতি। রয়েছে তাদের সমৃদ্ধ সাহিত্য-পরিচয়। সেসব সমৃদ্ধ সাহিত্য ও বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি আজ নিঃশেষ হতে চলেছে পৃষ্ঠপোষকতা ও সুস্থ পরিবেশের অভাবে। মনে রাখতে হবে, এ দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এসব সাহিত্য ও সংস্কৃতি সভ্যতার অমূল্য সম্পদ। শুধু তাই নয়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক জীবনের মূল্যও আমাদের কাছে অনেক বেশি, কেননা তারাই মূলত প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা মানুষের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

সংস্কৃতি যেহেতু মানুষের জীবনধারা ও দৈনন্দিন অভ্যাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত, কাজেই জীবন-জীবিকার বদলের ফলে সংস্কৃতিতে তার প্রভাব পড়া মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

১৯৬১ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে যখন ঠিকই এলাকা প্লাবিত হয় তখন সেখানে বসবাসকারী চাকমা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে সরে আসতে হয়। এর ফলে তাদের ঐতিহ্যবাহী ও জীবিকানির্ভর জুমচাষ উপযোগী পর্যাপ্ত জমি না থাকায় পাহাড়ে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা ক্রমে সরে আসে এ পেশা থেকে। ফলে সংস্কৃতিতে এর প্রভাব পড়ে।

জুমচাষ সম্পৃক্ত বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান এখন আর আগের মতো পালিত হচ্ছে না। সভ্যতার বিবর্তন ও নাগরিকতার ছোঁয়ায় পোষাক-আশাক, খাদ্যাভাস এমনকি নামকরণের ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মিশনারীদের ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির পরিবর্তনে বা নিজস্বতা হারাবার জন্য কম দায়ী নয়। পূর্বে সনাতনধর্মী যে সাঁওতালরা সোহরাই, কারাম পালন করতো তারা এখন বড় দিন পালন করে। নামকরণেও খ্রিস্টানধর্মের প্রভাব স্পষ্ট (যেমন আলবার্ট সরেণ, জুলিয়া মান্দি)। শুধু সাঁওতাল কেন, গারো এবং পাহাড়ে বসবাসরত বম-খুমি-ম্রোদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

পরিশেষে যে কথাটা বলা প্রয়োজন তা হলো–আমরা যদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য টিকিয়ে রাখতে চাই, তাহলে রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে। সেই সঙ্গে সংখ্যাগুরু বাঙালিকে হতে হবে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আর নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার ও প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে তাদেরকেই। সেদিন নিশ্চয়ই উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত সাঁওতাল পল্লী থেকে দক্ষিণ-পূর্বের কেওক্রাডাং পর্বত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে সেই স্বপ্নের বীজ।

১৫ মার্চ ২০০১ : জাতিসংঘের মহাসচিব মান্যবর কফি এ আনান-এর উপস্থিতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফিতা কাটছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর উদ্বোধন শেষে ভাষা গ্যালারী ঘুরে দেখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দের একাংশ

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দের একাংশ

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দের একাংশ

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ এর ভাষামেলার উন্মুক্ত গ্যালারীতে কৌতূহলী দর্শকদের একাংশ

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ পালনোপলক্ষে সেমিনারে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন
অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস, বাংলাদেশ

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ পালনোপলক্ষে সেমিনারে আলোচনা করছেন
জনাব শামসুজ্জামান খান, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ পালনোপলক্ষে সেমিনারে আলোচনা করছেন
অধ্যাপক পবিত্র সরকার, প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন
অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

১১ মে ২০১২ ইউনেস্কো মহাপরিচালক মিসেস ইরিনা বোকোভা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা গ্যালারী পরিদর্শন করেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিব এ-সময় উপস্থিত ছিলেন।

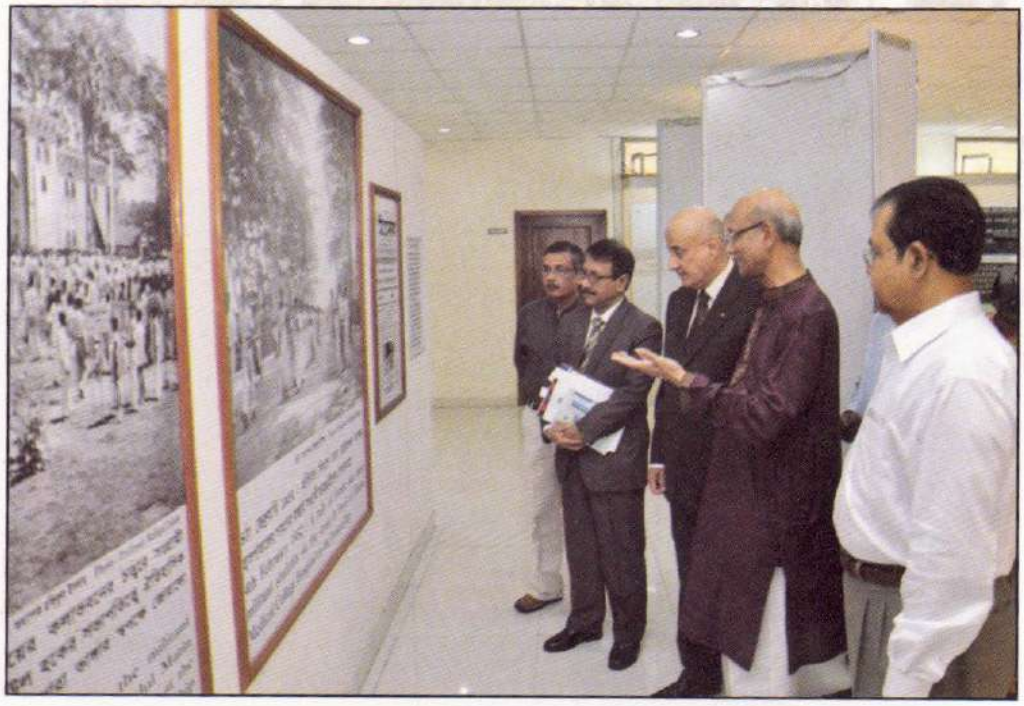

১৫ জুলাই ২০১২ আইসেস্কো মহাসচিব ড. আবদুল আজিজ ওতমান আলতোয়াইজিরি (মাঝে) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা গ্যালারী পরিদর্শন করেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিব এসময় উপস্থিত ছিলেন।

৪ আগস্ট ২০১২ ইউনেস্কো উপ-মহাপরিচালক মিস্টার গেতাচিউ এনগিদা (মাঝে) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা গ্যালারী পরিদর্শন করেন। সঙ্গে রয়েছেন মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘরের এশিয়া গ্যালারীর একাংশ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘরের দক্ষিণ এশিয়া গ্যালারীর একাংশ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘরের এশিয়া ও অন্যান্য দেশ গ্যালারীর একাংশ

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনোপলক্ষে বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বহির্দেয়াল

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনোপলক্ষে বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রবেশ-তোরণ

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১২ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনোপলক্ষে বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তর-ভাগ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৪তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করছেন।
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০